নির্বাচন ব্যবস্থায় বিকল্প প্রস্তাবনা:

বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি

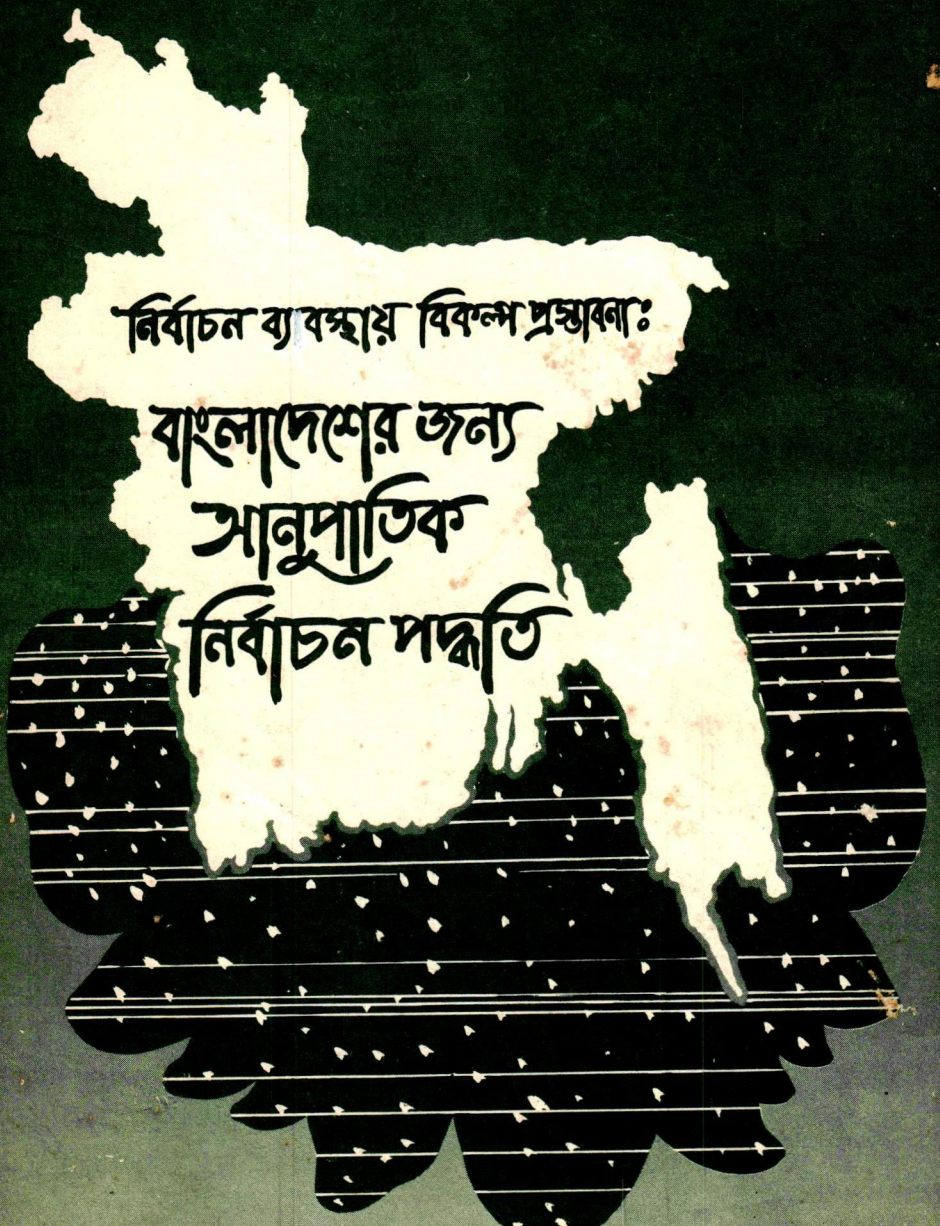

ফেরদৌস আহমদ কোরেশী

নির্বাচন ব্যবস্থায় বিকল্প প্রস্তাবনা ঃ

বাংলাদেশেরজন্য আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি

ফেরদৌস আহমদ কোরেশী

সমীক্ষা প্রকাশনী
৩৫ ইন্দিরা রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল,১৯৯০

লেখক কর্তৃক
সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ বিশ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ঃ এম, এ জাফর

প্রকাশক ঃ
সমীক্ষা প্রকাশনীর পক্ষে
ওমর ফারুক ভূঁইয়া
৩৫, ইন্দিরা রোড,
ঢাকা-১২১৫
টেলি ঃ ৩১২৭৫৪

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের প্রতিটি নির্বাচনের পরেই জালভোট, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভূয়া ভোটপত্রে ভোট প্রদান, গোনা-গুনতিতে কারচুপি, শক্তিপ্রয়োগে প্রকৃত ভোটারদের ভোটপ্রদানে বাধাদান--ইত্যাদি হরেক রকমের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু কেন এমন হয়?

1

একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর এভাবে মরিয়া হয়ে ওঠার জন্য দায়ী প্রচলিত 'গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি'। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে--সংঘাতমূলক রাজনীতি বা 'Adversary Politics'। এই পদ্ধতিতে সামান্য ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়ে একটি ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়তে পারে। আবার ছলে-বলে-কলে-কৌশলে অন্যদের চাইতে বেশী ভোট সংগ্রহ করতে পারলেই একজন প্রার্থী একটি এলাকার দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে বসতে পারেন-সামগ্রিক ভোটের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পেয়েও। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে সকল পক্ষেই থাকে চরম ঝুঁকি। যা জন্ম দেয় পরাজয়ের ভীতি জণিত প্রচন্ড মানসিক অস্থিরতা। ফলে প্রার্থীগণ এবং তাঁদের সমর্থকগণ হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে পড়েন এবং বিজয়লাভের জন্য নীতিবোধ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে বসেন।

নির্বাচন যদি প্রার্থীর ব্যক্তিগত মান-সম্মান বা 'বাঁচা-মরা'র প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এক্ষেত্রে কাউকে সংযত হবার উপদেশ দিয়ে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হলে নির্বাচন পদ্ধতির মৌলিক পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন আর তা হতে পারে কেবলমাত্র 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি' প্রবর্তনের মাধ্যমে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে সংঘাতধর্মী (Adversary) রাজনৈতিক ধারার বদলে সমন্বয়ধর্মী (Consociational) ধারা গড়ে ওঠে। যার শুভ-প্রভাবে জনজীবনেও পরমত সহিষ্ণুতা এবং সমঝোতার মনোভাব দানা বাঁধে। অর্থাৎ এর প্রভাব কেবল নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজজীবনে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও দু'টি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়।

বাংলাদেশ একটি সুসংবদ্ধ জনপদ। অধিবাসীরা অভিন্ন আঞ্চলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের অধিকারী। সেদিক থেকে আমরা জাতিগতভবে সৌ-ভাগ্যবান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মতাদর্শ এবং শ্রেণীস্বার্থগত দ্বন্দ্বসংঘাতের কারণে বাংলাদেশের এই সুসংবদ্ধ জনসমষ্টিও বহুকেন্দ্রিক বা Plural চরিত্রের অধিকারী এবং সেই কারণে অত্যন্ত দ্বন্দ্ব মূখর। একদিকে সম্পদের অপ্রতুলতা, অপরদিকে সম্পদ বন্টনে রাজনৈতিক ক্ষমতা চূড়ান্ত হওয়ার কারণে নির্বাচনে জয়-পরাজয় এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর জন্য আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে একটি সমন্বয়ধর্মী রাজনৈতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলা সম্ভব হলে সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব

www.pathagar.com

সংঘাতের তীব্রতা কমে আসবে এবং কেবলমাত্র তখনই বাংলাদেশের প্রকৃতিগত সুসংবদ্ধতা উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর শুভ প্রভাব ফেলতে পারবে।

বর্তমান আলোচনায় আমরা 'গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি' ও 'আনুপাতিক ভোট পদ্ধতি'র তুলনামূলক পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি। এ থেকে গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা 'গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি' ব্যবহার করছি ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে। দেশের বাস্তব পরস্থিতি বিচার করে স্থানীয় প্রয়োজনের নিরীখে এই ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেনি। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আমাদের 'প্রেম-ঘৃণা' (Love hate) দৃষ্টিভংগীর কারণে গণতন্ত্রের তথাকথিত 'প্রতীক' হিসেবে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের যে ভাবমূর্তি আমাদের চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার ফলেই সম্ভবতঃ এই চরম 'অগণতান্ত্রিক' নির্বাচন ব্যবস্থাকে আমরা বিনা-প্রতিবাদে এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছি। এমনকি এই নির্বাচন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা, কিংবা বিকল্প নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা থেকেও আমরা এ যাবৎ বিরত থেকেছি। পৃথিবীতে বৃটেন এবং তার কলোনীসমূহ ছাড়া আর কোথায়ও হুবহু এই ধরণের নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত নেই এবং অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশ বহু পূর্বে এই পদ্ধতি বর্জন করে আনুপাতিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, এই তথ্যটি বোধ হয় আমাদের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে পরিজ্ঞাত নয়।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নটিকে একটি প্রধান জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার 'গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি' দ্বিমুখী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সহনীয় হলেও, ত্রিমুখী বা বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবশ্যম্ভাবীরূপে চিরস্থায়ী অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। বাংলাদেশের রাজনীতিকে স্থিতিশীল দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমাবদ্ধ করার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে 'আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি' প্রবর্তন করেই কেবল বাংলাদেশে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এই উপলব্ধি থেকেই বিষয়টির উপর জাতীয় পর্যায়ে আলাচনা-পর্যালোচনা শুরু করার লক্ষ্যে এই দুটি নিবন্ধের অবতারনা। নিবন্ধ দু'টি ১৯৮৭-৮৮সালে লন্ডনে অবস্থানকালে রচিত। প্রথমটি ঢাকার সাপ্তাহিক পূর্ণিমার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, গণ সংগঠন, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন এবং সার্বিকভাবে সকল সচেতন নাগরিকের দৃষ্টি এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট হবে এবং অচিরেই এ ব্যাপারে একটি জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই আশা করছি।

ফেরদৌস আহমদ কোরেশী
ঢাকা ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯০

www.pathagar.com

নির্বাচন পদ্ধতি ঃ বিকল্প প্রস্তাবনা

১.১ বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটতে পারছে না, এই অভিযোগ অনেক পুরনো। এজন্যে নির্বাচনের ব্যবস্থাপনাকেই সচরাচর দায়ী করা হয়। কেবল কি ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্যই এমনটি হচ্ছে? না–কি প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির ভেতরেই কোন গলদ রয়েছে?

কিছুকাল পূর্বে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে 'নির্বাচন পদ্ধতি' সংস্কারের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিলো। কয়েকদিন পর তা আবার ভেঙ্গে দেয়া হয়।

'নির্বাচন পদ্ধতি' এবং 'সরকার পদ্ধতি'র কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে সংকট কিভাবে এবং কতটা অনিবার্য হয়ে পড়ে––এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে অনুসন্ধান এবং মূল্যায়নের সূচনা করার জন্যই এই পর্যালোচনা।

১.২ পশ্চিমী গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিত্বের ধারণা

রাজতন্ত্র এবং 'সার্বভৌমত্বের ঐশীতত্ত্বে'র বিপরীতে রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনায় সর্ব–সাধারণের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর অন্যতম। সরকার পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'উর্ধ্বমুখী ক্ষমতাপ্রবাহ তত্ত্ব' আজ আর বিতর্কিত নয়। এমনকি যে সব দেশে ক্ষমতা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়, সেসব দেশেও রাষ্ট্রযন্ত্রের পেছনে সর্বসাধারণের সম্মতির অন্ততঃ একটা লোক দেখানো ছাপ এঁকে দেবার চেষ্টা হয়ে থাকে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই গোত্রপ্রধান বা সর্দার নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির মতামত নেয়ার রেওয়াজ দেখা গেছে। কিন্তু বৃহত্তর পরিমন্ডলে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাধারণ মানুষের মতামত নেয়া বা তাদের প্রতিনিধি বাছাই করার ব্যাপারটা বেশী দিনের নয়।

ইউরোপে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের উন্মেষের পর্যায়ে প্রথমে সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূদের নিয়ে পরামর্শসভা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাধারণ মানুষের 'প্রতিনিধিত্ব' তখনও ছিল অকল্পনীয়। ১৭৮০ সালে ইংলণ্ডের ডিউক অব রিচমণ্ড গোটা ইংলণ্ডকে সমান জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনেকগুলো এলাকায় ভাগ করে প্রত্যেক এলাকার প্রতিনিধি ঠিক করে দেবার প্রস্তাব তোলেন। এই 'উদ্ভট' কথাবার্তার জন্য তাঁকে 'র‍্যাডিকেল ডিউক' নাম দেয়া হয়।

আজ থেকে ঠিক দুশ' বছর আগে, ১৭৭৯ সালে, গ্রোভেন্সের পরিষদে মার্কুইস দ্য মিরবু–পার্লামেন্টে নির্বাচকমন্ডলীর অভিমতের যথাযথ প্রতিফলন দাবী করে 'চমক'

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছিলেন। সেই অবস্থান থেকে মাত্র দু'শ' বছরে বিশ্বময় গণতান্ত্রিক চেতনা আজ যেখানটায় এসে পৌছেছে তা বিস্ময়কর বৈ কি!
আজ কেবল পশ্চিমী জগতেই কেবল নয় গোটা পৃথিবীতেই 'জনপ্রতিনিধিত্বের' অধিকার সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে।

১.৩ নির্বাচনের সংস্কৃতি

জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হবার পর জনগণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র কে হবেন সে প্রশ্নটি এসে যায় অবধারিতরূপে। কোন নিয়মে এবং কি পদ্ধতিতে এই প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে--আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনায় তার গুরুত্ব কতটা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
গত শতাব্দীর শেষ দিকে বৃটিশ শাসকদের উদ্যোগে সীমিত পর্যায়ে গ্রামীণ স্বশাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর পশ্চিমী ধাঁচের নির্বাচনের সাথে এতদঞ্চলের জনগনের প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর থেকে এদেশের মানুষ ধাপে ধাপে বৃহত্তর পর্যায়ে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বৃটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ হবার পরে সীমিত অথবা পূর্ণ ভোটাধিকারের প্রয়োগ হয়েছে বেশ কয়েকবার। মোটের উপর, গত একশ' বছর ধরে ইউনিয়ন বা গ্রাম পরিষদ থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন ও হচ্ছে। তাতে জনগণ অংশ নেয় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে। নির্বাচন নিয়ে কলহ-বিবাদ এমনকি দাংগা-হাঙ্গামা ও হর-হামেশা হচ্ছে। এক অর্থে নির্বাচন আজ এতদঞ্চলের গণ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়েছে।

১.৪ বাংলাদেশে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি ঃ বৃটিশ গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি

নির্বাচনের অর্থ যদি হয় দেশ শাসনের জন্য জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বেছে নেয়া, তাহলে নির্বাচন যাতে ত্রুটিমুক্ত এবং যথার্থ হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। প্রথমতঃ জনপ্রতিনিধিত্বের ধরণটা কেমন হবে, অর্থাৎ নির্বাচন পদ্ধতি কোন ধরণের হবে তা ঠিক করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ এবং ত্রুটিমুক্ত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নিশ্ছিদ্র প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে হবে।
বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। বাংলাদেশের, তথা উপ-মহাদেশের মানুষ যে পদ্ধতির নির্বাচনের সাথে পরিচিত তা হচ্ছে বৃটেনে প্রচলিত

www.pathagar.com

'গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি'। ভারত, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেই কেবল এই পদ্ধতি এখনও বহাল দেখা যচ্ছে।

এই পদ্ধতিতে একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনিই সকল ভোটদাতার প্রতিনিধিত্ব করবেন। এর ফলে ১০/১২ জন প্রার্থীর মধ্যে ভোট ভাগাভাগির দরুন শতকরা দশভাগের কম ভোট পেয়েও একজন প্রার্থী 'নির্বাচিত' হয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ শতকরা ৯০ ভাগ ভোটার যাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তিনিই হবেন সকলের প্রতিনিধি। এ জন্যে এই পদ্ধতিকে First past the post বা winner takes it all নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলায় আমরা একে বলবো 'বুড়ি ছোঁয়া পদ্ধতি।' গ্রাম বাংলার গোল্লাছুট খেলার মত ছুটে গিয়ে যে আগে 'বুড়ি' ছুঁতে পারবে সবটুকু কৃতিত্বই তার একার।

১.৫ ব্রিটিশ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতির নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ এবং কার্যতঃ 'অগণতান্ত্রিক' এই ধারণাটি সর্ব প্রথম তুলে ধরেন ফরাসী গণিতবিদ জাঁ চার্লস দ্য বোর্দে, ১৭৭০ সালে। তিনি অংক কষে দেখিয়ে দেন এই পদ্ধতিতে কীভাবে ভোটদাতাদের ইচ্ছার অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৭৮৫ সালে মার্কুইস দ্য কন্দরসেতও একই অভিমত প্রচার করেন। এর পর থেকে এ নিয়ে ইউরোপ জুড়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকে। যার পরিণতিতে আজ বৃটেন ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় দেশেই এই তথাকথিত 'বুড়ি ছোঁয়া পদ্ধতি' প্রচলিত নেই।

এই পদ্ধতির ত্রুটিগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) এই পদ্ধতিকে গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি বলা হলেও, এতে কার্যক্ষেত্রে প্রায়শঃ সংখ্যালঘিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদ ব্রিটেনের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মিলবে ঃ

ব্রিটেনের ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ৫ টি সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী দলের ভোট এবং আসন প্রাপ্তির শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাল	বিজয়ীদল	প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত আসন
১৯৭৪ (ফেব্রু)	লেবার	৩৭.১%	৪৭.৩%
১৯৭৪ (অক্টো)	লেবার	৩৯.২%	৫০.২%
১৯৮৯	টরী	৪৩.৯%	৫৩.৪%
১৯৮৩	টরী	৪২.৪%	৬১.১%
১৯৮৭	টরী	৪২.২%	৫৭.৮%

দেখা যাচ্ছে এই ক'বছরে একবারও ব্রিটেনে প্রকৃত অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ক্ষমতাসীন দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করলেও তারা একবারও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জনসমর্থন পায়নি।

www.pathagar.com

(খ) এই পদ্ধতিতে একটি দল বেশী ভোট পেয়েও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হতেপারে। অপরদিকে কম ভোট পেয়েও একটি দল ক্ষমতায় যেতে পারে। কারস্টেয়ার্স (Carstairs)একটি কাল্পনিক নির্বাচনের বিবরণ দিয়ে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

ধরা যাক, কোন একটি নির্বাচনে মোট তিনটি দল সর্বমোট একশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ফলাফল নিম্নরূপ হতেও পারে ঃ

উত্তরাঞ্চলের ৫১ টি অসন

দল	ভোট সংখ্যা	ভোটের হার	প্রাপ্ত আসন
ক দল	১,৫৫,০০০	৫১%	৫১
খ দল	২৬,৪০০	৯%	০
গ দল	১,২২,০০০	৪০%	০

দক্ষিণাঞ্চলের ৪৯ টি আসন

ক দল	২২,২০০	৮%	০
খ দল	১, ৫৭,৬০০	৫৪%	৪৯
গ দল	১,১১,২০০	৩৮%	০

মোট আসনের ফলাফল ঃ

ক দল	১,৭৭,২০০	৩০%	৫১
খ দল	১,৮৩,০০০	৩১%	৪৯
গ দল	২, ৩৩,২০০	৩৯%	০

দেখা যাচ্ছে সব চাইতে বেশী ভোট পেয়ে গ দল একটি আসনও পায়নি। অপরদিকে সব চাইতে কম ভোট পেয়েও ক দল সরকার গঠনের শক্তি অর্জন করেছে।

এই কাল্পনিক নির্বাচনের কথা বাদ দিয়ে বাস্তব ক্ষেত্র থেকেও দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যেমন, ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে বৃটেনে টরী দল বেশী ভোট পেয়েও কম আসন পেয়েছিল।

বৃটিশ সাধারণ নির্বাচন ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

দল	শতকরা ভোট	প্রাপ্ত আসন
টরী	৩৭.৮%	২৯৭
লেবার	৩৭.১	৩০১

www.pathagar.com

(গ) এই পদ্ধতিতে একটি দল যথেষ্ট ভোট পেয়েও সংসদে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে বৃটেনের লিবারেল (বর্তমান ডেমোক্রেট) দলের ভাগ্য বিপর্যয় তার দৃষ্টান্ত।

লিবারেল/এলায়েন্স ঃ ভোট এবং আসন

নির্বাচন	ভোট	আসন
১৯৭৪(ফেব্রু)	১৯.৩%	২.২%
১৯৭৪(অক্টো)	১৮.৩%	২.০৫%
১৯৮৯	১৩.৮%	১.৭%
১৯৮৩	২৫.৪%	২.৬%
১৯৮৭	২২.৬%	৩.৩৮%

১৯৮৩ ও ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে লিবারেল ও শ্রমিক দলের ভোট ও আসনের তুলনামুলক হিসাব থেকেও এই পদ্ধতির দুর্বলতা স্পষ্ট ফুটে ওঠে ঃ

	লেবার		লিবারেল	
সাল	ভোট	আসন	ভোট	আসন
১৯৮৩	২৭.৬%	২০৯	২৫.৪%	১৭
১৯৮৭	৩০.৮%	২২৯	২২.৬%	২২

দেখা যাচ্ছে, ১৯৮৩ সালে লেবার ও লিবারেল ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র শতকরা ২ ভাগ, কিন্তু লেবার আসন পেয়েছে ২০৯টি, লিবারেল মাত্র ১৯টি। ১৯৮৭ সালেও শতকরা ২২.৬% ভোট পেয়ে লিবারেল পার্টি আসন পেয়েছে মাত্র ২২টি, মোট আসনের শতকরা ৩ ভাগের সামান্য বেশী।

লেবার দলের সমর্থন কতক এলাকায় পুঞ্জীভূত থাকায় এবং লিবারেল সমর্থন সারাদেশে ছড়ানো থাকায় এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে।

অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে সামান্য ভোটের ব্যবধানে আসন সংখ্যায় ব্যাপক হেরফের হয়ে যেতে পারে। জাতীয় রাজনীতিতে যার প্রতিক্রিয়া হতে পারে সুদুরপ্রসারী। লেবার পার্টি ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে ৩৯.২% ভোট এবং ২১৯টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছিল। ১৯৭৯ সালে তারা মাত্র শতকরা ২% কম ভোট পেয়ে ৫০ টি আসন হারায়। যার ফলে টরী দল সরকার গঠন করে এবং ব্রিটেনের রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়।

(ঘ) এই পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু সমর্থনপুষ্ট একটি দল জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুগান্তরকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আজকের ব্রিটেনই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। টরী দল বৃটেনের কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামোটিকে ভেঙ্গে অবাধ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ বিগত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের প্রত্যেকটিতে তাদের বিরুদ্ধে ভোট প্রদানকারীদের সংখ্যা ছিল ঃ

১৯৭৯	৫৬.১%
১৯৮৩	৫৭.৬%
১৯৮৭	৫৭.৮%

www.pathagar.com

(চ) এই পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে সর্বসম্মত রায় বা কনসেনসাসের বদলে রেষারেষির রাজনীতি বা 'এডভার্সারী পলিটিক্স'–এর উদ্ভব ঘটে। ক্ষমতার বাইরে থাকার অর্থ অনেকটা নিজ দেশে প্রবাসী হয়ে থাকা। ফলে ক্ষমতায় যাবার জন্য যেমন বিরোধী পক্ষ মরীয়া হয়ে ওঠে, তেমনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্ষমতাসীনরা ন্যায় অন্যায় সব রকমের পন্থারই আশ্রয় নেয়।
পরিণামে এই পরিস্থিতি রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় অগ্রগতির ধারাবাহিকতার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

১.৬ ভিন্নতর পদ্ধতি ঃ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

'বুড়ি ছোঁয়া' পদ্ধতির এইসব সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে ১৮৩৪ সালে ভিক্তর কঁসিদারে (Victor Considerant) ভোটের অনুপাতে আসন বন্টনের সুপারিশ করে তালিকা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। 'পিআর লিষ্ট সিস্টেম' নামে অভিহিত এই পদ্ধতিতে তিনি দেশ জুড়ে বিভিন্ন দলের দলভিত্তিক সমর্থনের আনুপাতিক হারে তাদের মধ্যে আসন ভাগ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন।
গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ আইনবিদ টমাস হেয়ার এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখালেখিতে এই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী জোরদার হতে থাকে।
১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমস্টারডামে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির সম্মেলনে টমাস হেয়ারের প্রস্তাবিত আনুপাতিক পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হয়। ১৮৬৫ সালে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'জেনেভা সংস্কার সমিতি'। এই সংস্থা ১৮৬৭ সালে পি আর বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে মত দেয়।
১৮৮১ সালে বেলজিয়ামে 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তন আন্দোলন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সালে ভিক্তর দ্য হন্দত (Victor D'Hondt) তাঁর আনুপাতিক পদ্ধতি প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সালের আগস্ট মাসের ৭, ৮ ও ৯ তারিখে বেলজিয়ামের আন্টওয়ার্পে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে দ্য হন্দতের পদ্ধতি অনুমোদন লাভ করে।
সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো লক্ষ্য করার মত ঃ
(ক) এই সম্মেলন মনে করে সাধারণ গরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা নির্বাচকমন্ডলীর স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং এতে প্রতারণা এবং দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়, পরিণামে সংখ্যালঘিষ্ঠ নির্বাচক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে যেতে পারে।
(খ) এই সম্মেলন মনে করে দেশের প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের হাতে ক্ষমতা নিশ্চিত করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। এতে সংখ্যালঘুদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত থাকে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সকল উল্লেখযোগ্য অংশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব কায়েম থাকে।

www.pathagar.com

(গ) বিভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির কথা মনে রেখেও এই সম্মেলন মনে করছে দ্য হন্দতের তালিকা পদ্ধতির সাথে বিভাজক পদ্ধতি যুক্ত করলে তা ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলোর চাইতে অনেক বেশী সুবিধাজনক হয় এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বাস্তবায়নের এটাই বাস্তব ও কার্যকর পন্থা।
১৮৯৯ সালে বেলজিয়াম সর্ব প্রথম এই আনুপাতিক বা পি আর পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯২০ সাল নাগাদ ইউরোপের সব দেশই একে একে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

১.৭ আনুপাতিক পদ্ধতির প্রয়োগ

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বে সকল ভোটার মতামত সর্বাধিক পরিণামে প্রতিফলিত করা।
এই পদ্ধতির সবচাইতে সরল রূপ হচ্ছে দলভিত্তিক জাতীয় নির্বাচন। এতে নির্বাচনে কোন নির্দিষ্ট প্রার্থী থাকে না। ভোটাররা কোন বিশেষ প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে কেবল তাদের পছন্দসই পার্টি বেছে নেবেন। সমগ্র দেশকে একক নির্বাচনী এলাকা গণ্য করে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে বিভিন্ন দলের মধ্যে আসন ভাগ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে কোন ভোটই নষ্ট হয় না। এই ব্যবস্থায় নির্বাচনের অন্যতম দৃষ্টান্ত তুরস্ক এবং ইসরায়েল।
এই ব্যবস্থার সমালোচনায় বলা হয়, এতে ভোটারদের সাথে প্রতিনিধিদের কোন সরাসরি সংযোগ ঘটে না। পার্টির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রার্থী তালিকা দেয়া হয় এবং ঐ তালিকার ভিত্তিতেই প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ফলে কোন এক অঞ্চল থেকে বেশী সংখ্যা প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে যেতে পারে, আবার অপর কোন অঞ্চল প্রতিনিধিত্বহীন থাকতে পারে। যার ফলে ক্ষমতার শীর্ষস্থানেই জাতির ভাগ্য বাঁধা পড়ে থাকে।
ইকনমিস্ট পত্রিকা ১৯৮৬ সালে 'দা ওয়ার্ল্ড এটলাস অফ ইলেকশান্স' নামে এক সমীক্ষা প্রকাশ করে। এতে পৃথিবীর ৩৯ টিতে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক' আখ্যা দেয়া হয়েছে।
এই দেশগুলোর মধ্যে ২৩টিতে সরাসরি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে--
অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, আইসল্যণ্ড, ইসরায়ল, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড এবং ভেনিজুয়েলা।
অপরদিকে গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি (ব্রিটিশ পদ্ধতি) রয়েছে মোট ১৪টি দেশে। বাহামা, বারবাদোস, বোতসোয়ানো, কানাডা, ফিজি, ভারত, জেমাইকা, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দীপপুঞ্জ, ত্রিনিদাদ, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অপর দু'টি রাষ্ট্রের একটিতে (পশ্চিম জার্মানী) মিশ্র পদ্ধতি, অপরটিতে (অষ্ট্রেলিয়া) 'মেজরিটান' পদ্ধতি চালু রয়েছে।

www.pathagar.com

জার্মানীর মিশ্র পদ্ধতিতে কতক আসন সরাসরি গরিষ্ঠ ভোটে এবং অপর কিছু আসন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিরিখে নির্ধারিত হয়।

মেজরিটান পদ্ধতিতে প্রার্থীদের একজনও যদি শতকরা ৫০ ভাগ না পায় তাহলে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যালটের আয়োজন করা হয় অথবা ভোটারগণ একাধিক প্রার্থীকে অগ্রাধিকারসূচক ভোট প্রদানকরেন। কোন প্রার্থী সরাসরি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভোট না পেলে পরবর্তী অগ্রাধিকার ভোটের ভিত্তিতে জয়-পরাজয় নির্ধারিতহয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রিটিশ গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি মুলতঃ প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেই এখনও টিকে আছে।

জাপানের উচ্চকক্ষের একশ'টি আসনে নির্বাচন হয় আনুপাতিক পদ্ধতিতে। নিম্নপরিষদের নির্বাচনে যৌথ নির্বাচনী এলাকা ব্যবহার করা হয় বিধায় বাস্তবে তা ব্রিটিশ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাতে আনুপাতিক পদ্ধতির সুবিধা অনেকাংশে বহাল থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারটাও সেখানকার প্রায় চিরস্থায়ী দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বই ব্যাপকভাবে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি। আমাদের দেশে আমরা ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে যে নির্বাচন পদ্ধতি এখনো আঁকড়ে ধরে আছি, পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশ বহু পূর্বেই তা বর্জন করেছে।

খোদ ব্রিটেনেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে জনমত এখন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের লিবারেল পার্টি বহু বছর ধরেই এই পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু অপর দুই প্রধান দল বর্তমান পদ্ধতি বহাল রাখতে চায়। উপরে ব্রিটিশ নির্বাচনের যে বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে তা থেকে এর কারণ খুবই স্পষ্ট। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু হলে এই দুই দলের আসন সংখ্যা কমে যাবে এবং লিবারেল পার্টি অনেক বেশী আসন পাবে। লিবারেল পার্টির সমর্থন সারাদেশে প্রায় সমভাবে ছড়ানো থাকায় এবং অপর দুই দলের একটির সমর্থন দেশের দক্ষিণে, অপরটি দেশের উত্তরে বেশী কেন্দ্রীভূত থাকায় এরকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। তবে ব্রিটিশ জনমতও ক্রমেই আনুপাতিক পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছে। এক সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, ব্রিটেনের শতকরা সত্তুর ভাগেরও বেশী লোক এখন মনে করেন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বই অধিকতর গণতান্ত্রিক। এ বছরের ১৯৮৯ লেবার পার্টি সম্মেলনে অনুপাতিক পদ্ধতির পক্ষে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য এসেছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনেও আনুপাতিক পদ্ধতি চালু হবার সম্ভাবনা এখন আর উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

ব্রিটেনে আনুপাতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আরো একদিক থেকে চাপ আসছে। ব্রিটেন ইইসি'র সদস্য। এখন ইউরো-পার্লামেন্টের ক্ষমতার পরিসর অতি দ্রুত বাড়ছে। ইউরো-পার্লামেন্টে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা আসছেন আনুপাতিক পদ্ধতিতে। কেবল ব্রিটেনই ব্যতিক্রম। (ব্রিটেনেও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ইউরো এমপি নির্বাচিত হচ্ছেন আনুপাতিক পদ্ধতিতে)। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ এ ব্যাপারে সামঞ্জস্য চায়। একই

www.pathagar.com

পার্লামেন্টে দু'ধরনের প্রতিনিধিত্ব বহাল রাখাকে তাঁরা অযৌক্তিত মনে করেছেন। ব্রিটেনকে এ ব্যাপারে মনস্থির করার জন্য সময় দেয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে অন্ততঃ ইউরো পার্লামেন্টের নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু করতে বৃটেন বাধ্য হবে। তারপর স্বভাবতই ওয়েস্ট মিনিস্টারে গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি বহাল রাখা অরো কঠিন হয়েপড়বে।

১.৮ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন রূপ

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভোট সংখ্যার অনুপাতে আসন বন্টন করা, যাতে করে সমাজের কোন অংশই সংসদে প্রতিনিধিত্বহীন না থাকে। তবে শতকরা একশ' ভাগ আনুপাতিকতা অর্জন করা বাস্তবে আদৌ সম্ভব নয়। গত এক শতাব্দি ধরে গণিতবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আসছেন। এ জন্যে আসন বন্টন এবং ভোট গণনায় তাঁরা বেশ কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। বিভিন্ন দেশ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী এর যে কোন একটি বেছে নিতে পারে।

এই পদ্ধতিগুলোকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) বৃহত্তম অবশিষ্ট বা লারজেস্ট রিমেইন্ডার পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পার্টির মনোনীত তালিকা থেকে ভোটের নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এই কোটা নির্ধারণের জন্য আবার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। সব চাইতে বেশী ব্যবহৃত কোটা হচ্ছে–হেয়ার কোটা। জন স্টুয়ার্ট মিলের সহযোগী আইনজ্ঞ টমাস হেয়ার এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। এতে মোট ভোট সংখ্যাকে প্রার্থী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যত ভোট হয় তত ভোটের জন্য একটি করে আসন বরাদ্দ করে অবশিষ্ট আসন 'সর্বোচ্চ অবশিষ্ট ভোট'–এর ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। কোটা পদ্ধতিকে আরো নিখুঁত করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে আরো কয়েকটি পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

হাগেনবার্গ–বিশোফ কোটা, ইমপেরিয়াল কোটা এবং ড্রুপ কোটা।

কি পরিমাণ ভোটের জন্য একটি আসন বরাদ্দ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য এই সব পদ্ধতিতে কোটা ঠিক করা হয়। উল্লেখিত চারটি কোটার ফরমূলা নিম্নরপ ঃ

হেয়ার কোটা=ভোট সংখ্যা÷আসন সংখ্যা

হাগেন বাথ বিশোফ কোটা=ভোট সংখ্যা÷(আসন সংখ্যা–১)

ইম্পেরিয়াল কোটা=ভোট সংখ্যা÷(আসন সংখ্যা–২)

ড্রুপ কোটা=ভোট সংখ্যা÷(আসন সংখ্যা–১) +১

(খ) সর্বোচ্চ গড় বা হাইয়েস্ট এভারেজ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে আসন বন্টনে সাধারণ 'বিভাজক' ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক বেলজিয়ামের ভিক্তর দ্য হন্দত। পরবর্তীতে আরো নিখুঁত আনুপাতিকতার জন্য অপর দু'ধরণের বিভাজক উদ্ভাবিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

(অ) Saint Lague বিভাজক
(আ) পরিবর্তিত Saint Lague বিভাজক।
দ্য হন্দত-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আসন বন্টনের জন্য মোট ভোট সংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি বিভাজক দিয়ে ভাগ করতে হয়।
Saint Lague পদ্ধতিতে ভাগ করতে হয় পায়ক্রমে ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাতি বিভাজক দিয়ে। পরিবর্তিত Saint Lague পদ্ধতিতে বিভাজক হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ১, ২, ৩, ৫, ৭, ইত্যাদি। এই পর্যায়ে এ ব্যাপারে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই। আনুপাতিকতার মূল্য লক্ষ্য বিভিন্ন দলের মধ্যে ভোটের অনুপাতে আসন বন্টন করা। আসন বন্টনের নিয়ম-কানুন ও বিভিন্ন পদ্ধতি দলের নেতৃস্থানীয়রা এবং নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিতরা অনায়াসে রপ্ত করে নিতে পারেন।

১.৯ আনুপাতিক নির্বাচনের কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

আরেও লিফার্ট গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ
(ক) কনসোসিয়েশনাল বা সমন্বয়ধর্মী
(খ) মেজরিটান বা গরিষ্ঠতা নির্ভর
লিফার্টের বিশ্লেষণে 'মেজিরিটান' পদ্ধতিতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। (লিফার্ট ঃ ব্রিটিশ ধাঁচের সাধারণ গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতিকেও মেজরিটান পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন)
এতে কিভাবে কার্যক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।
লিফার্টের মতে গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হতে পারে কেবল তখনই যখন ক্ষমতা নিয়মিত হাত বদল হয়। কিন্তু যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু দলের শক্তি প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং দীর্ঘকাল ধরে অপরিবর্তিত থাকে, তখন ব্যাপারটা মোটেই গণতান্ত্রিক থাকে না।
কারণ, তার ফলে জনগণের একটি অংশ বা কোন কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বরাবরই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকে। লিফার্ট মনে করেন, প্লুরাল বা বহুদলীয় সমাজে পুরোপুরি বৈষম্যমুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তবে আনুপাতিক জনপ্রতিনিধিত্ব সংখ্যালঘুদের সর্বাধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তার কাছাকাছি যেতে পারে।
বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র পরিপূর্ণ গণতন্ত্রেই সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিপদ হচ্ছে সংখ্যালঘুদের হাতে ভেটো ক্ষমতা চলে যাবার সম্ভাবনা। এক বা একাধিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এই অধিকারের অপব্যবহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের যে কোন উদ্যোগকে ঠেকিয়ে দিতে পারে।
লিফার্ট তাই মনে করেন, শতকরা একভাগেরও কম ভোটের অধিকারী কোন গোষ্ঠির রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর দাবী থাকা উচিত নয়।

www.pathagar.com

এ জন্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিতে পার্লামেন্টে প্রবেশের পূর্ব যোগ্যতা হিসেবে একটি দলকে সর্বনিম্ন কি পরিমাণ ভোট পেতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এই সর্বনিম্ন ভোট সীমা (থ্রেশোল্ড)–এর নীচে অবস্থানকারী দলগুলোর প্রাপ্ত ভোট হিসাবের বাইরে রাখা হয়। অথবা ক্ষেত্র বিশেষে পরবর্তী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দলের হিসাবে ধরা হয়।

১.১০ আনুপাতিক পদ্ধতির সমালোচনা

আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনায় বলা হয়, এই পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলীর সাথে প্রতিনিধিদের সরাসরি যোগাযোগের অসুবিধা দেখা দেয় এবং যেহেতু প্রার্থী মনোনয়নে পার্টির ভূমিকাই মুখ্য, সেহেতু সকল ক্ষমতা পার্টির কেন্দ্রীয় দফতরে কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে।
এই বক্তব্যের জবাবে বলা যায়, দলভিত্তিক রাজনীতিতে পার্টির ভূমিকা মুখ্য হতে বাধ্য। গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতিতেও পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর থেকেই মনোনয়ন দেয়া হয়।
যৌথ নির্বাচনী এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের সাথে নির্বাচকমণ্ডলীর সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং দলীয় তালিকায় অগ্রধিকার নির্ধারণে ভোটারদের মতামতকে মর্যাদা দেবার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ঃ
প্রথমতঃ প্রতিটি প্রাথমিক এলাকায় যে দল বেশী ভোট পাবে ঐ এলাকায় সেই দলেরই একজন প্রার্থীকে আসন বরাদ্দ করা। দ্বিতীয়তঃ দলীয় প্রার্থী তালিকায় অগ্রাধিকারক্রম সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে নির্দ্ধারণ করা। এভাবে এলাকার সাথে প্রতিনিধির দুরত্ব দূর হতে পারে।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অরেকটি সমালোচনা হচ্ছে এর ফলে ছোট ছোট দলের দরকষাকষির ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে দলের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে পারে।
এর জবাবে বলা যায়, এই পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন ভোট সীমা বেঁধে দিয়ে অতি ক্ষুদ্র দল গঠন সহজেই নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে। এই পদ্ধতি মাঝারি দলগুলোকে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দেয় এবং দল বিশেষের একক কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়। যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রকৃত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে।
বলা যেতে পারে, এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে জটিল। এর জবাবে বলা যায় নির্বাচনে ভোট প্রদানের এবং সমর্থন জ্ঞাপনের ব্যাপারটা সব পদ্ধতিতেই একই ধরণের। পার্থক্যটা আসন বন্টন এবং ভোট গণনায়। যা একান্তভাবেই ব্যবস্থাপক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কর্মী পর্যায়ের ব্যাপার। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে যা যে কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বোধগম্য হবে।
(ঈদ সংখ্যা ঃ পূর্ণিমা/৮৯)

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক পদ্ধতি

১. পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা সাধারণভাবে আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বর্তমানে প্রচলিত গরিষ্ঠ ভোট পদ্ধতির পরিবর্তে আনুপাতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয়টিকে জাতীয় অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে বিকল্প নির্বাচন পদ্ধতির নিম্নরূপ কাঠামো গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. কোন ধরণের আনুপাতিক পদ্ধতি?

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ তার স্থানীয় প্রয়োজনের নিরীখে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি সুবিধাজনক হবে তা স্থির করা ব্যাপারে আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখতে হবে। আমাদের ভোট দাতাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। কাজেই অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা পদ্ধতি, যেখানে ভোটারকে ভোটপত্রে বিভিন্ন প্রার্থীর নামের পাশে অগ্রাধিকার লিখে দিতে হয়, আমাদের দেশের জন্য সুবিধাজনক হবেনা।

আমাদের দেশে স্থানীয় আনুগত্য বা Local patriotism অত্যন্ত তীব্র। সেই হেতু জাতীয় ভিত্তিক তালিকা পদ্ধতি, প্রবর্তন করা হলে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার উদ্ভব ঘটতে পারে।

সব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের জন্য যৌথ নির্বচানী এলাকা (Multiple constitaeacy) এবং আসন প্রতি এক ভোট পদ্ধতির আনুপাতিক নির্বাচন এবং সেই সাথে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে জাতীয় ভিত্তিক তালিকা পদ্ধতি সব চাইতে সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

এই ব্যবস্থায় প্রথমে গোটা দেশকে অনেকগুলো যৌথ নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হবে। এই যৌথ নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের দল ও প্রার্থীকে ভোট দেবেন। অতঃপর প্রাপ্ত সর্বমোট ভোটের অনুপাতে বিভিন্ন দলের মধ্যে আসন বন্টন করা হবে এবং দলীয় প্রার্থী তালিকা থেকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

এ সব 'আঞ্চলিক' আসনের পাশাপাশি থাকবে 'জাতীয় আসন'। যার ফলাফল নির্ধারিত হবে সকল নির্বাচনী এলাকার সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে।

ভোট গণনার ক্ষেত্রে 'সরল হেয়ার কোটা' এবং 'গরিষ্ঠ অবশেষ (Largest remairder) পদ্ধতি' অনুসরণ করাই বোধ হয় ভালো হবে। (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রঃ।)

৩. নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ

বাংলাদেশের বর্তমানে ৬৪টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে। বর্তমান ৩৩০ আসনের পার্লামেন্টে জেলাওয়ারী গড় সদস্যসংখ্যা ৫.১৬। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে উত্তম আনুপাতিকতার জন্য নূন্যতম আসন সংখ্যা হওয়া উচিত ৫। সে হিসেবে এই জেলাগুলোকেই ভবিষ্যত আনুপাতিক নির্বাচনে 'যৌথ নির্বাচনী এলাকা' হিসেবে গণ্য করা প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে।
একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বাংলাদেশের বর্তমান জেলা সদর সমূহ প্রায় সমদূরত্বে বিন্যাস্ত এবং ভৌগলিক ও যোগাযোগ জাল বিন্যাসের গুরুত্বপূর্ন সংযোগ-(nodes) তাদের অবস্থান। ঐতিহ্যগতভাবেও এই শহরগুলো প্রশাসনিক ও সামাজিক / রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় প্রস্তাবিত নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের বর্তমান ৬৪টি জেলা হবে ৬৪ টি 'যৌথ নির্বাচনী এলাকা' (Songle Multipla member Constitiency) উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক 'ক' জেলা জনসংখ্যানুপাতে মোট ৫টি আসন পেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'ক' জেলা হবে একটি '৫-আসন বিশিষ্ট যৌথ নির্বাচনী এলাকা'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতি ৩লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একটি আসন বরাদ্দ করা হলে ১১ কোটি জনসংখ্যার জন্য সারা দেশে মোট আসন সংখ্যা হবে--৩৬৭টি। এই হিসাবে ৩৬৭টি

www.pathagar.com

জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক আসন এবং তার শতকরা ২৫ ভাগ, অর্থাৎ ৯২টি 'জাতীয় আসন' মিলিয়ে জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন সংখ্যা ৪৫৯ হওয়া বাঞ্চনীয় হবে।

এভাবে প্রশাসনিক জেলাসমূহকে প্রতিনিধিত্বের প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করার ফলে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নিয়ে কলহ–বিবাদের চির অবসান ঘটবে। প্রশাসনিক জেলাসমূহের সীমারেখা প্রায়–চিরস্থায়ী হবার ফলে রাজনৈতিক প্রতনিধিত্বের একটি স্থায়ী কাঠামো গড়ে উঠবে। জাতীয় পর্যায়ে বন্টনের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখার বিষয়টিতে আমরা পরে আসছি।

৪. প্রার্থী মনোনয়ন ঃ দলীয় প্রার্থী তালিকা–

নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্ট হবার পর নির্বাচনের পরবর্তী ধাপ হবে বিভিন্ন দলের প্রার্থী মনোনয়ন। আনুপাতিক ব্যবস্থায় নির্দলীয় প্রার্থী হবার কোন সুযোগ নেই। স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রার্থী তালিকা পেশ করবে। আঞ্চলিক যৌথ নির্বাচনী এলাকা সমূহ এবং জাতীয় আসনের জন্য পৃথক পৃথক প্রার্থী তালিকা পেশ করতে হবে।

৫. ভোট প্রদান

প্রতিটি ভোটারের দু'টি ভোট থাকবে। একটি ভোট তিনি দেবেন তাঁর পছন্দের দলকে। অপরটি তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে। তিনিইচ্ছা করলে এক দলকে ভোট দিয়ে অপর কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। কিংবা তিনি ইচ্ছা করলে এর যে কোন একটি বা উভয় ভোট প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে পারবেন।

৬. পার্টির পূর্বযোগ্যতা ঃ সর্বনিম্ন ভোট সীমা

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এই সমস্যা এড়াবার জন্য সর্বনিম্ন ভোটসীমা বা Threshold বেঁধে দেয়া প্রয়োজন। এই সীমার

www.pathagar.com

নীচে যে সব দল ভোট পাবে তারা প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়বে। তাদের প্রাপ্ত ভোট হিসাবের বাইরে থাকবে। অগ্রাধিকারমূলক ভোট ব্যবস্থায় এ সব ভোটের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার সূচক ভোট হিসাবে ধরা হয়, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকারমূলক ভোট ব্যবস্থা সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না।

9

তুরস্কে নির্বাচন হয় জাতীয় ভিত্তিক তালিকা পদ্ধতিতে। সেখানে সর্বনিম্ন ভোট সীমা ১০٪। জার্মানীতে জাতীয় আসনের ক্ষেত্রে এই সীমা শতকরা ৫٪। জার্মানীর গ্রীন পার্টি শতকরা ৫ ভাগ ভোট লাভে ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘকাল পার্লামেন্টের বাইরে থেকেছে। গত নির্বাচনে ঐ দল সর্বপ্রথম ৫٪ এর সীমা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। এখন পঃ জার্মানীর জাতীয় সংসদে ঐ দলের প্রায় ৩০ জন সদস্য সংসদে রয়েছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সীমা আঞ্চলিক পর্যায়ে ৫٪ এবং জাতীয় পর্যায়ে ১٪ হলেই দলের সংখ্য ৫/৬টিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

৭. ভোটগণনা

প্রথমেই বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত 'মোট দলীয় ভোট' নিরূপন করতে হবে। 'দলীয় ব্যালেটে' দলের পক্ষে প্রদত্ত ভোট এবং 'প্রার্থী ব্যালটে' দলের সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের যোগফল হবে 'মোট দলীয় ভোট'। নিচে একটি কাল্পনিক নির্বাচনের হিসাব থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে ঃ

ধরা যাক ক খ গ ঘ ঙ দল একটি যৌথ নিবাচনী এলাকায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এতে মোট ভোটার সংখ্যা ১১,০০,০০০ এবং আসন সংখ্যা ৫।

ধরা যাক বিভিন্ন দলের ভোট প্রাপ্তি নিম্নরূপ ঃ

দল	দলীয় ভোট	প্রার্থী ভোট	মোট দলগত ভোট
ক	৪,৫০,০০	৪,৬০,০০০	৯,১০,০০০
খ	২,২০,০০০	২,৪০,০০০	৪,৬০,০০০
গ	১,৭০,০০০	১,৯০,০০০	৩,৬০,০০০

www.pathagar.com

ঘ	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	৩,২০,০০০
ঙ	৮০,০০০	৪০,০০০	১,২০,০০০
মোট	১০,৮০,০০০	১০,৯০,০০০	২১,৭০,০০০

দলীয় ভোট দেয়া হয়নি–২০,০০০
প্রার্থী ভোট দেয়া হয়নি–১০,০০০

বাংলাদেশের জন্য আমরা সরল 'হেয়ারকোটা' ভিত্তিতে আসনবন্টনের কথা বলেছি। অর্থাৎ, মোট ভোট সংখ্যাকে আসন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে আসন বন্টনের প্রাথমিক 'কোটা' নির্ধারণ করতেহবে। এক্ষেত্রে ২১,৭০,০০০ ভোটকে ৫ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাচ্ছি--৪,৩৪,০০০।

দেখা যাচ্ছে, এই কোটা অনুযায়ী প্রথম কিস্তিতেই 'ক' দল ২টি আসন এবং 'খ' দল ১টিআসন পেয়েযাবে।

এরপর ২টি আসন অবশিষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে আমরা 'গরিষ্ঠ অবশেষ' বা larght Remainder পদ্ধতি অনুসরণ করবো।

এ জন্য অবশিষ্ট ভোট নিম্নরূপে গুণতে হবেঃ

দল	মোট ভোট	ব্যবহৃত ভোট	অবশিষ্ট ভোট
ক	৯,১০,০০০	৮,৬৮,০০০	৪২,০০০
খ	৪,৬০,০০০	৪,৩৪,০০০	২৬,০০০
গ	৩,৬০,০০০	০	৩,৬০,০০০
ঘ	৩,২০,০০০	০	৩,২০,০০০
ঙ	১,২০,০০০	০	১,২০,০০০

মোট অবশিষ্ট ভোট--৮,৬৮,০০০

এখন 'গরিষ্ঠ অবশেষ পদ্ধতি' প্রয়োগ করে পরবর্তী রাউন্ডের একটি আসন প্রাপ্তির জন্য ভোট সীমা হবে=মোট অবশিষ্ট ভোট ÷ (অবশিষ্টআসনসংখ্যা+১)।

অর্থাৎ, ৮,৬৪,০০০ ÷ ৩=২,৮৯,০০০

www.pathagar.com

আমরা দেখছি এই রাউন্ডে গ ও ঘ দল উভয়ে একটি করে আসন পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ চতুর্থ এবং পঞ্চম আসন পাবে যথাক্রমে গ ও ঘ দল।

10

ঙ দল এই নির্বাচনে কোন আসনই পাবে না।
চূড়ান্ত ফল হবে ঃ

দল	প্রাপ্ত আসন
ক	২
খ	১
গ	১
ঘ	১
ঙ	০

৮. জাতীয় আসন

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি প্রস্তবিত আনুপাতিক নির্বাচনে গোটা বাংলাদেশের জন্য মোট আসনের শতকরা ২৫ ভাগ (এক্ষেত্রে ৯২টি) আসন 'জাতীয় আসন' হিসেবে নির্দিষ্টথাকবে।

বিভিন্ন দল এই আসনগুলোর জন্য তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করে দেবে। জাতীয় ভিত্তিতে দলগুলোর প্রাপ্ত মোট ভোটের নিরীখে এই আসনগুলো বন্টন করা হবে। যে দল শতকরা হারে যতবেশী ভোট পাবে সেই অনুপাতে ঐ দল জাতীয় আসনের হিস্যা পাবে। ধরা যাক 'ক' দল সারা দেশে শতকরা ২৬ ভাগ ভোট পেয়েছে। তাহলে 'ক' দল প্রস্তাবিত ৯২টি জাতীয় আসনের ২৪টি পাবে। এবং ঐ দলের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রার্থী তালিকার ১ম থেকে ২৪ তম প্রার্থী বিজয়ী ঘোষিত হবেন। অধিকাংশ আনুপাতিক পদ্ধতিতে জতীয় ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

এর সুবিধা গুলো হচ্ছে ঃ

ক. এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যাঁদেরকে সাবৃক্ষণিক সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত থাকতে হয় তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনী দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত থেকে নির্দিষ্ট মনে কাজ করতে পারবেন। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব এলাকায় নেতৃত্ব প্রদানের অধিকতর সুযোগ পাবেন এবং এলাকার সাথে সম্পর্কহীন কেন্দ্রীয় নেতাদের বিভিন্ন এলাকায় মনোনয়ন দিতে গিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা দূর হবে।

খ. বিভিন্ন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনেক বেশী আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে পারবেন। পরস্পরকে মেনে নেবার প্রবণতা বাড়বে এবং পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়িকমবে।

গ. একই নির্বাচনী এলাকায় দুই দলের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁদের একজনকে অবশ্যই সংসদের বাইরে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ে উভয় পক্ষের ঝুঁকি এতই বেশী থাকে যে নির্বাচন মঞ্চ সচরাচর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এই সমস্যা এড়ানো যাবে।

ঘ. নারী সমাজের দুর্বলতর অংশ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের বিভিন্ন উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব এই পন্থায় কায়েম হতে পারে, যার ফলে 'দ্বিতীয় কক্ষে'র আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

ঙ. বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ প্রশাসক এবং অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, যাঁরা নীতি নির্ধারণে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম, কিন্তু রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে অভ্যস্ত নন, তাঁরা এই প্রক্রিয়ায় জাতি গঠনের কাজে অংশ নিতে পারবেন।

৯. প্রার্থী অগ্রাধিকার

আনুপাতিক পদ্ধতির একটি সমালোচনা হচ্ছে, এতে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই হয় না। তাছাড়া একটি দল যদি তিনটি আসন পায় তাহলে ঐ দলের কোন তিনজন প্রার্থী জয়ী হবেন?

www.pathagar.com

জাতীয় পর্যায়ের আসনে পার্টি তালিকায় পূবেই অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করে রাখলে এ নিয়ে কোন সমস্যা হবার কথা নয়।

কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে যেখানে প্রার্থীরা ঐ অঞ্চলের ভোটারদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, সেক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই এর প্রশ্নে ভোটারদের মতামতের মূল্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

দলীয় তালিকায় অগ্রাধিকার পূর্ব নির্ধারিত না করে, নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের নিরীখে করা হলে এই লক্ষ্য সহজেই অর্জিত হবে।

১০. এলাকার প্রতিনিধিত্ব

আনুপাতিক পদ্ধতির আরেকটি সমালোচনা হচ্ছে এতে এলাকার সাথে প্রতিনিধির সরাসরি যোগাযোগ থাকেনা।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক কর্মকান্ডে জড়িত না থাকাই উত্তম। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ সমূহকে যথাযথভাবে বিকশিত হতে দিলে তার প্রয়োজনও থাকে না।

তা সত্ত্বে ও এলাকার সাথে জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ সংযোগ দু'ভাবে হাতে পারে। প্রথমতঃ তাঁরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট যৌথ নির্বাচনী এলাকার সকল অধিবাসীরই প্রতিনিধিত্ব করবেন যৌথভাবে। দ্বিতীয়তঃ যৌথ নির্বাচনী এলাকার ভেতরেও আলাদা আসন চিহ্নিত করে ঐ এলাকায় যে দল বেশী ভোট পেয়েছে সেই দলের নির্বাচিত প্রার্থীকে সেখানকার প্রতিনিধি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com